লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্র ঃ আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক ও ভূমি ব্যবস্থাপনা

ড়ঃ মোহাম্মদ হাননান*

১.০ ভূমিকা

১.১ ঠিক কোন্ সময় থেকে বাঙলাদশে মানব ইতিহাস তথা লোক বসতির শুরু তা এখনো অজ্ঞাত রয়ে গেছে বলা চলে। এ পর্যন্ত যেসব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রাচীন গ্রন্থাদি ও অন্যান্য সূত্রে, যতোটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে বিষয়টির সত্য উদ্‌ঘাটন একরকম অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু সারা দুনিয়ার সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের যে ধারা তা বিশ্লেষণ করলে একথা অনুমান করতে একটুও কষ্ট হয় না যে, বাংলাদেশ অঞ্চলও এক সমৃদ্ধ সভ্যতার (তা অবশ্যই নগর সভ্যতার ধারাবাহী) অধিকারী ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতির মৃৎফলকগুলিতে প্রাচীন বাংলার লোকায়ত ও নগর জীবনের যে চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তা স্পষ্টতই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার একটি অবয়বকে আমাদের সমানে তুলে ধরে।

১.২ এছাড়া, চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণীতে, শীল ভদ্রের জীবন কাহিনীতে, তিব্বতী ঐতিহ্যে, ভারতীয় ন্যায় শাস্ত্রের ইতিহাস গ্রন্থে, এমনকি বৈদিক সাহিত্যের বেশ কিছু সুক্তেও প্রাচীন বাংলাকে চিহ্নিত করা যায়, এমন কিছু বিষয় থেকে তৎকালীন সমাজ কাঠামো, রাষ্টচিন্তা ও প্রশাসনিক অবস্থার একটা স্বরূপ উদঘাটন করা সম্ভব হয়।

২.০ প্রাচীন বাংলার সমাজ কাঠামোঃ আদি বাঙলার পরিচয়

২.১ বৈদিক সাহিত্যের বেশ কিছু সুক্তে বর্ণিত শুভ–অশুভ, দেবতা–দানব ও বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সংগ্রামের কাহিনী সমাজ কাঠামো বিশ্লেষণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঋগ্বেদে অত্যন্ত স্পষ্ট করেই সমাজের উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর (ধনী দরিদ্র) মানুষের কথা বারবার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা থেকে তৎকালীন সমাজ কাঠামোর একটা পরিচয় পাওয়া সম্ভবঃ

> "হে অবিনশ্বর অগ্নি, আমি তোমার স্তব করায়, যে সকল ধনী, আমাকে পঞ্চাশটি অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন, তুমি সেই সকল ব্যক্তিকে দীপ্তিশীল প্রচুর অন্ন এবং পরিচালকবর্গ প্রদান কর।"[১]

---

* সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২.২ এখান থেকে বৈদিক আর্য সমাজের সম্পত্তির মালিকানার উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক ও সমাজিক অসাম্যের আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। দাস– মালিকের কথা প্রসঙ্গে(ঋগ্বেদে কোথাও কোথাও একথা উল্লেখ করা হচ্ছে যে, কারো কারো শত শত ক্রীতদাস আছে)। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দরিদ্রদশায় পতিত সমাজের মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতা হারিয়ে ক্রমশ ক্রীতদাসে পরিণত হচ্ছে। তখন ক্রীতদাস বলতে দস্যু বা দাস অর্থাৎ শত্রুকে বোঝাত। এই দস্যু বা দাস বলতে সামাজিকভাবে কাদের বোঝান হতো, এরা এসেছিল কোন জনগোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায় থেকে তার একটা পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

২.৩ 'আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' নামে একটি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের আর্য ভাষা–ভাষী লোকেরা 'অসুর' জাতিভূক্ত। বৈদিক ও বেদোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে 'অসুর' শব্দটির যে খুব ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছে তা একমাত্র দেবগণের বিরোধী হিসাবেই।[২] অনেকের ধারণা এই 'অসুর' বলতে আর্যপূর্ব যুগের এ দেশীয় বাঙালী মানুষদেরই বোঝাচ্ছে।

২.৪ সমগ্র বৈদিক সাহিত্য জুড়েই এ অঞ্চলের লোকদের ও তাদের সংস্কৃতির প্রতি আর্যদের প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। তাদের নিজেদের মধ্যে ছিল আর্য সংস্কৃতি সম্পর্কে দারুণ অহংবোধ। নিজেদের এলাকাকে তারা নাম দিয়েছিল 'ব্রহ্মবিদেশ', 'আর্যাবত' ইত্যাদি। আর্যসংস্কৃতির সীমানার বাইরের অংশকে তারা দস্যুদের দেশ বলে অভিহিত করতো।[৩] বিদ্রোহ পর্যন্ত এগিয়ে এরা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল একমাত্র ব্রাত্যদেশে (কথিত অসুরগণের দ্বারা অর্থাৎ বলা যায় আদি বাঙালীদের দ্বারা। এই অসুরগণের দেশকে তারা 'ব্যাত্যদেশ' বা বেদবহির্ভূত দেশ বলে অভিহিত করতো। সেজন্য আর্যাবর্তের কোনো লোক যদি তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে বাঙলাদেশে আসতো, তাহলে তাকে 'পুনোষ্টম' নামে এক যজ্ঞ সম্পাদন করে শুদ্ধ হতে হতো।

২.৫ সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, একটা ভিন্নতর জাতি, ভিন্নতর আচার–ব্যবহার, ভিন্নতর সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে আর্যদের অনমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দিয়েছিল। গর্বিত আর্যজাতি তাদের দর্পিত উন্নাসিকতায় বিজাতিসুলভ শ্রেণী– চেতনায় এ দেশবাসী আদি বাঙ্গালীদের নানা খেতাবে ভূষিত করে তোলে ('ঐতরের ব্রাহ্মণ' বলছে 'দস্যু, ভীমের দিগ্বিজয় প্রসংগে 'মহাভারত' বাঙলার সমুদ্র তীরবর্তী লোকদের বলছে ' ম্লেচ্ছ', 'ভাগবত পুরাণ' বলছে 'পাপ' এবং এদের ভাষাকে বলা হয়েছে ''অসুর' ভাষা)। এছাড়া আর্যাবর্তের বাইরের লোকজন (যেখানে বাঙলা ও বাঙালীরা ছিল অন্যতম) রাক্ষস, পক্ষী, দৈত্য, নাগ প্রভৃতি নামেও অভিহিত হতো।

২.৬ বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই আর্য ও অনার্য ভাবধারা, মতাদর্শ, সংস্কৃতির বিরোধ, বিদ্রোহ ও সংঘাত এ অঞ্চলে নিয়মিত গতিতে চলেছে। তবে বাংলাদেশে আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির ছোঁয়া আসে সকলের পরে।[৪] এমনকি

একাদশ দ্বাদশ শতকের দিকেও যখন আর্য–ছোঁয়া সমাজের উঁচুমানের জীবন যাপনকারীদের মধ্যে বিস্তৃত, তখনো পর্যন্ত, কি তারও অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের জীবনযাপনকারীদের কাছে এদেশীয় লোকসংস্কৃতি, লোকভাবদর্শই একমাত্র দর্শন, একমাত্র মতাদর্শ হিসাবে কাজ করেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বর্ণাশ্রিত আর্য–সমাজের ভিত্তি অনড় ও অনমনীয়ভাবে এদেশের সমাজে গেড়ে বসে।

২.৭ সে হচ্ছে এক নতুন ইতিহাস, নতুন ভাবধারার সূচনা। এই নতুন বিষয়গত সূচনার পশ্চাতে একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন অবশ্যই ছিল। এই যে বর্ণাশ্রিত সমাজ যা বাঙালীকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল তা থেকে ইতিহাসেরই শুরু বলা যায়। তাই বাঙলাদেশের ইতিহাসের সূচনায়ই সমাজ কাঠামোগত বর্ণাশ্রম সমস্যা দেখা যায়, যা পরবর্তীতে জাতিভেদ প্রথায় রূপ নেয়। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র কাঠামোতেও তা সমূহ প্রভাব ফেলে।

৩.০ সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস

৩.১ বর্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এভাবে বাঙলার আদিম সমাজ সম্পর্কে (কৌম সমাজে) ভাঙন দেখা দিল এবং সম্পত্তির মালিকানা, সামাজিক পদমর্যাদা এবং মতাদর্শের পার্থক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও অসাম্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হলো।

৩.২ পদমর্যাদায় সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রা রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুবিধাভোগী অর্থাৎ অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়ে পরিণত হলো। শ্রমজীবী মানুষ ও নিরন্ন ক্রীতদাসদের উপর শোষণ ও প্রভূত্ব করার ধর্মীয় ও তত্ত্বগত স্বীকৃতিও তারা পেয়েছিল।

৩.৩ কারণ ব্রাহ্মণরা প্রচার করেছিল যে, ব্রহ্ম (সৃষ্টিকর্তা) নিজ শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মার (পুরুষের) মুখ থেকে সৃজিত হয়েছে ব্রাহ্মণ (সেজন্য তারা দেবতার পক্ষ থেকে কথা বলতে পারেন), হাত থেকে সৃজিত হয়েছে ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ যোদ্ধা শ্রেণী), উরু থেকে বৈশ্য (অর্থাৎ বণিক শ্রেণী), আর পদযুগলের ময়লা থেকে শুদ্র (অর্থাৎ ভৃত্য শ্রেণী)[৫]।

৩.৪ সৃষ্টি মাহাত্ম্যের এই ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়াল। ব্রাহ্মণের সন্তানই ব্রাহ্মণ হবে আর শুদ্রের সন্তান হবে সব সময়েই শুদ্র। যে বর্ণ হিসাবে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে বর্ণে থেকে জীবন অতিবাহিত করাই তার নিয়তি। এ বর্ণ ব্যবস্থা পরবর্তীকালে গীতায় নূতনভাবে সংজ্ঞায়িত হয়ে চরম আকার ধারণ করে। গীতার রূপকাররা এই চেতনাকে শুধু ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ রাখেনি, তা রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থায়ও কায়েম করে ফেলে।

৩.৫ আর সমাজে যে শ্রেণীর মানুষগুলোকে শুদ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হলো তারা স্বভাবতই ছিল দরিদ্র অথবা অর্থনৈতিকভাবে ধনীদের ওপর নির্ভরশীল। শূদ্রদের জীবন তাই ছিল অতিকষ্টের, কিন্তু তার চেয়েও কষ্টের ও লাঞ্ছনার জীবন ছিল তাদের, যারা

ছিল অন্ত্যজ বা অচ্ছুৎ। অচ্ছুৎ বলে গণ্য করা হতো তাদেরই যারা কোন বর্ণেই পড়ে না। বলা হয়েছিল, ঈশ্বর শুধুমাত্র একটি কর্তব্য সমাধার জন্যই শুদ্রদের নির্দেশ দিয়েছেন "বিনয়াবনত চিত্তে তোমাপেক্ষা উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের সেবা করো।"[৬] উচ্চবর্ণের কাউকে যদি কোনো শুদ্র অপমানজনক বাক্য বলে, তবে তার মুখ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড পুড়ে বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ ছিল। শুধু তাই নয় ব্রাহ্মণের সংগে তর্করত শুদ্রের মুখ ও কানে ফুটন্ত তেল ঢেলে দেওয়ার জন্য সম্রাটের ওপর আদেশ ছিল।[৭]

৩.৬ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সামাজিকভাবে কারা ছিল এই শূদ্র শ্রেণীর অধিবাসী? অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, শুদ্ররা আসলে ছিল আর্যদের হাতে পরাভূত ও বশীভূত স্থানীয় অধিবাসী আদি বাঙালী সম্প্রদায়। অতএব, দুই বিপরীত মতাদর্শের প্রতিভূ, দুই সামাজিক অবস্থানের নিমিত্তহেতু, অর্থনৈতিক দিক থেকে উৎপাদনের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণী দ্বন্দ্বে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। সেদিক থেকে বাঙলার বর্ণ বিন্যাস সরাসরি ব্রাহ্মণ ও শুদ্র অন্ত্যজ এই দুই ভাগে বিভক্ত। অনেক সমাজ বিজ্ঞানীরমতে, এ অনেকটা পিরামিডের গঠনের মতো–

"সুউচ্চ মার্গে অর্থাৎ চূঁড়ায় ব্রাহ্মণ, মধ্যে শুদ্র সম্প্রদায়, আর পদতলে অন্ত্যজ, অস্পর্শ্য ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়।[৮]

৩.৭ ঐতিহাসিকদের মতে, বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবাই ছিল শুদ্র। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের কোনো উল্লেখ অন্তত বাঙলাদেশ প্রসংগে পাওয়াই যায় না। বাংলাদেশে তাই কোনোকালেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুনির্দিষ্ট বর্ণ হিসাবে গঠিত বা স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ,

> "An important factor in the evolution of this final stage is the growing fiction that almost all non-Brahmins were Sudras. The origin of this fiction is perhaps to be traced to the extended significance given to the term Sudra in the Purans, where it denotes not only the members of the fourth caste, but also those members of the three higher castes who accepted any of the heretical religions or were influenced by Inntric rites. The predominance of Buddhism and Tantric Saktism in Bengal, as compared with

other parts of India since the eighth century A. D. perhaps explains why all the notable castes in Bengal were regarded in the Brihad-diharma Purana and other later texts as Sudras.[৯]

৩.৮ ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশের আর সকল বর্ণকেই সঙ্কর শুদ্রবর্ণ হিসাবে ধরে তিনটি মাত্র শ্রেণীতে তাদের বিভক্ত করে তাদের প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদা ও বৃত্তি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। স্থান ও ব্যক্তিগত দিক থেকে এদের সংখ্যা ছিল ৩৬ জাতের। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ মতে, বিভাগ তিনটি যথাক্রমে– ১. উত্তম সঙ্কর (২০ টি উপবর্ণ), ২. মধ্যম সঙ্কর (১২টি উপবর্ণ) ৩. অপধসঙ্কর (৯টি উপবর্ণ)।

৪.০ অর্থনৈতিক শ্রেণী

৪.১ প্রাচীন বাঙালী রাষ্ট্র ও সমাজ এই বর্ণের মতো অর্থনৈতিক শ্রেণীতেও বিভক্ত ছিল। উৎপাদন সম্পর্ক ও বন্টন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে সমাজে শ্রেণীর স্তর বিভাগ নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রাচীন বাঙলায় এই শ্রেণীর সংগে বর্ণ প্রায় সার্থক অর্থেই ব্যবহার করা যেত। বর্ণ বিন্যাস ও শ্রেণী বিন্যাস প্রায় একই মাপকাঠিতে বাঁধা ছিল।

৪.২ কারণ "বৃত্তি বা জীবিকা ছিল বর্ণ–নির্ভর আর বর্ণ ছিল জন্ম নির্ভর। বৃত্তি যেকানে বর্ণ অনুযায়ী সেখানে বর্ণ ও শ্রেণী একে অন্যের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিবে এবং শ্রেণীর মর্যাদাও সেই সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী হইবে তাহা বিচিত্র নয়।"[১০]

নির্ভর নির্ভর

বৃত্তি ⟶ বর্ণ ⟶ জন্ম

৪.৩ ব্রাহ্মণরা বর্ণ হিসাবে যেমন, শ্রেণী হিসাবেও ঠিক তেমনি পৃথক ছিল। উচ্চ শ্রেণীর এই সম্পত্তি ও দাস মালিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজে ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকলে মৌর্য যুগের প্রশাসন একরকম প্রায় একনায়কতন্ত্রে রূপ নেয়। অবস্থাটা এমন যে, একটা মাত্র বর্ণ (ব্রাহ্মণ বর্ণ), একটাই ধর্ম (ব্রাহ্মণ্য ধর্ম), একটাই আদর্শ (পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শ) ছাড়া সমাজের অপরাপর মতাদর্শ ও শক্তি কে রাষ্ট্র আর স্বীকৃতি দিতে চাইত না।

৪.৪ আর শুদ্র অন্ত্যজরা শুধুমাত্র বর্ণ হিসাবেই নয়, অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবেও ছিল সমাজের নিম্নতম পর্যায়ের লোক। এদের প্রায় সকলেই দিনমজুর, ভূমিহীন কিংবা অন্যান্য পেশার সমাজ শ্রমিক। এভাবে বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার শুধু যে উদ্ভব ঘটল তাই নয়, রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোতে তা এক প্রধান বিষয়ও হয়ে দাঁড়াল। জন্ম কৌলীন্যের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি ও রাষ্ট্র মর্যাদা যখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল তখন তীব্র শ্রেণী দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি হল।

৪.৫ মৌর্যযুগে 'গণ ও সংঘ' নামে ক্ষত্রিয় প্রভাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের যেসব রাজ্য গড়ে উঠেছিল সেখানে কিছু পরিমাণ গণতান্ত্রিকতা ছিল। এ সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রগুলো ছিল তীব্র শ্রেণী, মালিকানা ও সমাজগত বিরোধে আকীর্ণ।

৫.০ গণবিদ্রোহ ও মুক্তি কামনা

৫.১ ভারতীয় আকরসূত্রে যেসমস্ত যুক্তরাষ্ট্রয়কে গণ বা সংঘ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো স্বায়ত্বশাসিত ও স্বাধীন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধাঁচের রাষ্ট্রে রাজা ছিল না, রাষ্ট্র নেতারা সেখানে নির্বাচিত হতেন। এসব রাষ্ট্রে (মগধ ও মৌর্য যুগে) রাজবংশ–শাসিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করে গেছে।

৫.২ এ সময়ের লিখিত স্মৃতিগ্রন্থ সমূহে সমাজের প্রভাবশালী উচ্চ শ্রেণীর সংগে গণ ও সংঘের সাধারণ সদস্যদের সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মহাভারতেও' এ ধরনের বিদ্রোহের খবর পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, গণ ও সংঘসমূহের প্রধান শত্রু হল তাদের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধ। বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে তো শাক্যপ্রজাতন্ত্রে ক্রীতদাসদের প্রকাশ্য বিদ্রোহের কথাই আছে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' রাজাকে পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, ভিন্ন রাজ্যের সম্ভাব্য আক্রমণের ভয় থেকে অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ অধিকতর বিপজ্জনক।[১১] এছাড়া পরবর্তীকালে বিশেষ করে পাল আমলে নিম্নশ্রেণীর 'কৈবর্ত' জাতি–শক্তির প্রবল অভ্যুত্থানের সংবাদ ইতিহাস স্বীকৃত।

৫.৩ স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, এতসব বিদ্রোহ ও সংঘাত কার এবং কাদের, অথবা কার এবং কাদের বিরুদ্ধে এ বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতখানি বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে বড়ো ধরনের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পবির্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে তা সহজেই অনুমেয়।

৫.৪ পালরাজাদের অধীন এক কৈবর্ত যাঁর নাম দিব্যোক, যে তাঁর প্রভূর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালকে (১০৭২–৭৫ খ্রীঃ) হত্যা করে, বরেন্দ্রভূমি অধিকার এবং তথায় কিছুকাল রাজত্ব করে, তাতে বোঝা যায় এই সময় প্রশাসন ব্যবস্থায় চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষ বিশেষ করে কৈবর্তরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ও সমাজে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান তারা অধিকার করেছিল। সময় সময় অনাচার–অবিচারের বিরুদ্ধে সমাজের নীচু তলার এ মানুষগুলোর এসব বিদ্রোহকে, সমাজের উঁচুতলার লোকেরা যে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিতেই নিতো তা বোঝা যায় কৈবর্ত বিদ্রাহের এই নায়ক দিব্যোক প্রসঙ্গে সন্ধ্যাকর নন্দীর উক্তি থেকে। সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্যোককে দস্যু ও 'উপধিব্রতী' (ভাপত) 'আখ্যা দিয়েছিলেন।'[১২]

৫.৫ বাঙালী জনগোষ্ঠী যাদের কাছে ছিল অস্পৃশ্য, যারা এই জনগোষ্ঠীকে করে রেখেছিল অন্ত্যজ, তারাই তথাকথিত অস্পৃশ্য কৈবর্ত দিব্যোকের দ্রোহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলার ইতিহাসে এ ঘটনা অনন্য। পাল সম্রাটদের

প্রবল প্রতাপী এ শাসন ও প্রভাব ভেদ করে শির উঁচু করে নির্ভয়ে দাঁড়াবার প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিল শত বছরের পীড়ন–শোষণ ও নির্যাতন, একথা বলা বাহুল্য।

৫.৬ ক্রমেই কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে আবার কোথাও সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। বেদসমূহের পৌরাণিক বিশ্বাস এবং পুরোহিতদের সম্পর্কে ইতপূর্বে জনগণের যে মোহ ছিল তা থেকে মুক্তির ফলে বেদবাদের প্রভাব অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হতে থাকল। ধর্মমত হিসেবে বেদবাদের নিরংকুশ কর্তৃত্বে অবিশ্বাসী হয়ে উঠল মানুষ। ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল প্রতিবাদ এবং ক্ষোভ। শত শত বছরের যে দুঃসহ জ্বালা সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপর চাপ ফেলেছিল, মানুষ সে পীড়ন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

৫.৭ আর তাদের এই মুক্তি কামনা শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মমত ও পথকে আশ্রয় করেই অভিব্যক্ত হয়ে উঠলো। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যখন সে বিদ্রোহ জ্ঞাপন করছে, তখন পাশাপাশি সে স্বতন্ত্র আদর্শ তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। ফলে প্রাচীন যুগের একেবারে প্রথম থেকেই মধ্যযুগ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে এখানে সেখানে বিভিন্ন ধর্মান্দোলন। বেদ ভিত্তিক মতাদর্শগত ও সামাজিক নিয়ম–কানুনও অস্বীকার করে ফেলল তারা এবং 'পরমজ্ঞান'–এ একমাত্র অধিকারী বলে ব্রাহ্মণদের এতকালের দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হল।

৫.৮ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়–তৃতীয় শতকে বর্তমান বাংলার উত্তরাঞ্চল প্রাচীন ভারতের বিশাল মৌর্যরাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছিল। বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড় ছিল এর রাজধানী। এই মৌর্যরাষ্ট্রের অন্যতম রাজা চন্দ্র গুপ্তের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কৌটিল্য। তাঁর রচিত অর্থশাস্ত্রের কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমান করা হয়, কৌটিল্য প্রণীত রাজনৈতিক মতবাদ খ্রীষ্টের জন্মেরপরবর্তী শতাব্দী থেকে গ্রন্থিত হয়। সমকালীন ইতিহাসে শুধু নয়, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও কৌটিল্যের রাজনৈতিক মতবাদ এক অসাধারণ বিস্ময় বলেই রাজনীতি ও তাত্ত্বিকদের কাছে প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রশাসন চিত্র উদঘাটনে কৌটিল্যের মতবাদ একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে স্মর্তব্য। এছাড়া রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ ও স্মৃতিগ্রন্থ সমূহ। এসব প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক প্রশাসনের প্রামাণ্য দলিল।

৬.০ রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ধারণা

৬.১ ইতঃপূর্বে সমাজ কাঠামোর আলোচনায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে 'গণ ও সঙ্ঘ' এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল অনেকটা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'প্রজাতন্ত্র' ধারণার মতো। এই ধারণা নিরবচ্ছিন্ন ছিল এমন কথা খুব জোর দিয়ে বলার অবকাশ কম। তবে এসব প্রজাতন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিলঃ

(১) বংশানুক্রমিকভাবে এই সময় রাজা হওয়া যেত না

(২) গণ ও সঙ্ঘের পরিচালনায় রাষ্ট্রপ্রধান পদে নির্বাচন বা মনোনয়ন অনুষ্ঠিত হতো

(৩) প্রয়োজনবোধে এই গণ ও সঙ্ঘ রাষ্ট্রকর্তার অপসারণও করতে পারতো

(৪) রাষ্ট্রকর্তা প্রার্থীপদের জন্যে বহুগণের সম্পন্ন চরিত্রের প্রয়োজন হতো।

(৫) রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণী বিষয়ে গণ ও সঙ্ঘই ছিল প্রধান নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী

(৬) নাগরিকদের জন্যে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, যদি নাগরিক রাষ্ট্রের আইন শৃংখলা পরিপন্থী কাজে জড়িত থাকতো অথবা আইন না মানতো

(৭) মৃত্যুদণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল, অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনার্থে।[১৩]

৬.২ উপরিউক্ত বর্ণনা মতে বোঝা যায়, গণ ও সঙ্ঘ ছিল অনেকটা পরিষদ সভার মতো। ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের খোলাফায়ে রাশেদিন কিংবা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ধাঁচের পলিটব্যুরো অথবা সম্রাট আকবরের ধর্মসভার মতো ছিল এই গণ ও সঙ্ঘের চরিত্র। প্লেটোর রাষ্ট্রচিন্তার সাথেও এর চেতনাগত সাযুজ্য রয়েছে অনেকখানি। তবে এই গণ ও সঙ্ঘ ছিল ক্ষত্রিয় প্রাধান্যে গড়া। ব্রাহ্মণ অভিজাতরা এখানে সম্ভবতঃ খুব কমই পাত্তা পেতেন এ ধারণা অত্যন্ত সঙ্গত। ধীরে ধীরে অবশ্য ব্রাহ্মণরা অভিজাত পরিষদ প্রাধান্য পেতে থাকে।

৬.৩ তবে এই দুই পরিষদের ক্ষেত্রেই অভিন্ন আশ্রয় ঘটেছে শুদ্রদের সামাজিক–প্রশাসনিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। দেখা গেছে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অনেক দূরে রাখা হয়েছে শুদ্রদের। আর শুদ্ররা ছিল দেশের সাধারণ প্রজা, যারা রাজনৈতিক–প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধার বাইরে থেকেছে চিরটা কালই, আজকের মতো। নগর জীবনের বাইরে প্রবীণ সমাজে কথিত 'মুক্ত সদস্যরাই' ভোট দিতে পারতেন, দিন মজুরদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে দেওয়া হয়নি।

৬.৪ কৌটিল্য প্রাচীন ভারতে যে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা আধুনিক দুনিয়ার জন্য এক বিস্ময়কর রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে স্বীকৃত হবে। ভাবতে অবাক লাগে যে, সেই প্রাচীনতম সময়েও প্রশাসন ব্যবস্থায় এই মতধারার প্রয়োগ ইচ্ছা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল। এই রাষ্ট্র চিন্তা ও শাসন ব্যবস্থার মতবাদে বলা হয়েছিল ঃ

(১) প্রশাসন ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত ও নিরাপদ রাখার জন্যে সামাজিক বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে হবে।

(২) রাষ্ট্র শাসন বিজ্ঞানের ভিত্তি হবে শাস্তিদানের বিধান। অর্থাৎ এই প্রশাসনিক মতবাদে সাধারণ মানুষকে বশে রাখার সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে শাস্তিদান অব্যাহত রাখাকেই উৎকৃষ্ট পথ বলে মনে করা হতো।

(৩) সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ, ক্ষোভ এবং বিক্ষোভকেই রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল সেকালে। বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিপদের চেয়েও এটাকে আরো বেশী 'গুরুতর' বলা হয়েছিল।

(৪) রাজনৈতিক প্রশাসনে গোপন কূটকৌশলের প্রয়োগ শুরু হয় এই সময় থেকেই

(৫) গোয়েন্দা বিভাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় এবং এখান থেকেই তা গুরুত্বসহকারে গড়ে তোলা হয়।

(৬) রাজকর্মচারীদের মধ্যে উৎকোচ প্রথা চালু করা হয়।

(৭) সরকারী কর্মচারীরা যাতে পরস্পর মনোমালিন্য ও বিদ্বেষ মনোভাবে সর্বদা বিরাজিত থাকে, গোপনে প্রশাসন থেকে তার ব্যবস্থাও করা ছিল।

(৮) জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনায় কাজে লাগানোর চিন্তাধারাও তাদের মধ্যে কাজ করেছে। রাষ্ট্রকর্তা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও সৃষ্টিকর্তা রাষ্ট্র প্রধানের উপর সদয় আছেন এমন ধারণা ও মনোভাব প্রচারণার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হতো সেকালে।

(৯) রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসৃত হয়েছিল তাতে দেখা যায়, 'শত্রুর শত্রু – বন্ধু' এই তত্ত্ব পরম ও চরমভাবে অনুসৃত হয়েছিল প্রাচীনকালে।[১৪]

৭.০ প্রশাসনিক কাঠামো

৭.১ এছাড়া শাসন কার্যাবলীর দিক থেকে প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্রীয় প্রশাসন নিম্নোক্তভাবে নীচ পর্যন্ত বিভক্ত ছিলঃ

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র–প্রশাসন
↓
ভুক্তি
↓
বিষয়
↓
মফল
↓
বীথি
↓
গ্রাম–প্রশাসন

৭.২ অর্থাৎ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি বীথি প্রশাসন গঠিত হতো। কয়েকটি বীথি নিয়ে মফল এবং কয়েকটি মফল নিয়ে বিষয়, তারপর কয়েকটি বিষয় নিয়ে ভুক্তি গঠিত হতো। ভুক্তি ছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বৃহত্তম প্রশাসনিক বিভাগ।

৭.৩ ভুক্তির যিনি প্রশাসক ছিলেন তার পদবীর নাম ছিল উপরিক। বিষয় প্রশাসনের প্রধানের নাম ছিল বিচারপতি।

৭.৪ কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলের খবর পাওয়া যাচ্ছে প্রাচীন বাংলায়। তার প্রধানের পদবীর নাম ছিল বাহনায়ক। পুলিশ সার্ভিসের (শান্তিরক্ষক কর্মকর্তা) প্রধানের পদবী ছিল চৌরাদ্ধরণিক।

৭.৫ পাল আমলে এসেই প্রাচীন বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রথম মন্ত্রী ও সচিবের পদবীধারী রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য তারা ছিলেন রাজ পরিবারেরই লোক, রাজপুরুষ। প্রায় সকল উচ্চপদেই বংশানুক্রমিক রাজ পরিবার সদস্যদের নিয়োগ অব্যাহত ছিল।

৭.৬ রাজার জ্যেষ্ট পুত্রকে যুবরাজ উপাধি দেওয়া হয়েছিল (আজো রাজতন্ত্রে পরিচালিত দেশসমূহে এই প্রথা প্রচলিত আছে)। যুবরাজ সাবালক হলেই অভিষেক অনুষ্ঠিত হতো।

প্রাচীন বাংলায় এছাড়া যেসমস্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন[১৫] ঃ

মহাকরণাধ্যক্ষ	ঃ	মুখ্য সচিব
মহামহত্তর	ঃ	স্বরাষ্ট্র সচিব
মহাসান্ধিবিগ্রহিক	ঃ	পররাষ্ট্র বিষয়ক সচিব
মহাসেনাপতি	ঃ	প্রতিরক্ষা বিষয়ক সচিব
মহাক্ষপটলিক	ঃ	অর্থ সচিব (অথবা মহাহিসাব রক্ষক)
মহাদণ্ডনায়ক	ঃ	প্রধান বিচারপতি
নৌকাধ্যক্ষ	ঃ	নৌবাহিনীর প্রধান
বলাধ্যক্ষ	ঃ	পদাতিক বাহিনীর প্রধান

৮.০ গ্রাম প্রশাসন

৮.১ তবে প্রাচীন বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে মজার তথ্য পাচ্ছি এখানে যে, সেই সময় গ্রাম প্রশাসনেরও অস্তিত্ব ছিল। ইতঃপুর্বে প্রশাসনিক বিভাগে আমরা দেখেছি, গ্রাম প্রশাসন হচ্ছে বুনিয়াদি প্রশাসন; সমগ্র কেন্দ্রীয় প্রশাসনে। এই গ্রাম-প্রশাসনের যিনি প্রধান ছিলেন তার উপাধি ছিল গ্রামিক। প্রাচীন বাংলার অনেক লিপিতে পঞ্চকল অষ্টকুল নামে বুনিয়াদি প্রশাসনের সংবাদ পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, মোট পাঁচজন প্রতিনিধি বা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত প্রশাসনকে বলা হচ্ছে পঞ্চকুল। সম্ভবত এখানে থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনের উদ্ভব। অষ্টকুল সম্ভবত একই ধাঁচের প্রশাসন, যার সদস্য সংখ্যা ছিল আটজন।

৮.২ আটশতকে পাল বংশের রাজত্বকালে গ্রাম প্রশাসনে আরো রদবদল ঘটে। এই সময় দশটি গ্রাম নিয়ে একটি গ্রামীন প্রশাসন গড়ে তোলার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, যার কর্তার নাম দশগ্রামিক। আবার চারটি গ্রাম নিয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামীণ বুনিয়াদি প্রশাসনের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে, এই প্রশাসনের প্রধানের নাম চতুরক। এটা সেন – বর্ম রাজাদের আমলে ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়।[১৬]

৯.০ চর্যাপদ দলিল অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

৯.১ প্রাচীন বাংলার সমাজ কাঠামো, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রশাসন চিত্র উদঘাটনে 'চর্যাপদ' কাব্য প্রাচীনতম দলিল হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে। 'চর্যাপদ' গ্রন্থখানি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও প্রাচীনতম দলিল। এর আগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ কেমন ছিল তা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

৯.২ তবে বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের ইতিহাস সন্ধানের এ অবিস্মরণীয় দলিলটি কিন্তু বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি, পাওয়া গিয়েছিল নেপালে। কেন এর পাণ্ডুলিপি নেপালে পাওয়া গিয়েছিল তার কারণ অনুসন্ধানেও প্রাচীন বাংলার প্রশাসন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইতিহাসকে উন্মোচিত করে।

৯.৩ চর্যাপদের রচনাকালে তৎকালীন বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে চরম অশান্তি ও দুর্যোগ নেমে এসেছিল। বিপর্যস্ত এই আর্থ-সামাজিক, পরিস্থিতির নাম দেওয়া হয়েছিল 'মাৎস্যন্যায়'। বৌদ্ধদের উপর সেদিন নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রশাসকবর্গ। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ঘোরতর অবনতির মুখে দলে দলে বৌদ্ধরা বাংলাদেশ ত্যাগ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়। যাওয়ার সময় তারা তাদের রচিত পান্ডুলিপিও সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধদের রচিত এই প্রমাণ্য দলিল চর্যাপদ তাই পাওয়া গিয়েছিল নেপালে।

৯.৪ চর্যাপদের মতো গ্রন্থেও প্রাচীন বাংলার এই গুরুতর প্রশাসনিক সংকটের কথা রূপকের মাধ্যমে চিত্রায়িত হয়েছে। গ্রন্থের ৩৩ নম্বর চর্যায় সেই সময়ের এই মর্মন্তুদ পরিস্থিতির বর্ণনায় বলা হচ্ছে, শেয়ালের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীও রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। (নিতি শিআলা সিহেসম যুজই)।[১৭]

৯.৫ নগরের যিনি কোটাল যার কাজ নগরবাসীকে রক্ষা করা, দেখা যাচ্ছিল সেই সময়টায় সে-ই চোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ। ('জো সো চোর, সোহি সাধী' অর্থাৎ যে চোর সেই দুষাধী= কোটাল)।[১৮] সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, পচন লেগেছিল প্রশাসনের অন্দর মহলেই। নগর মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিতে প্রশাসন তাই ব্যর্থ হচ্ছিল।

৯.৬ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এই রকম আরো অবনতির খবর আছে আরেকটি চর্যায়, যেখানে বলা হচ্ছে, একজন নতুন বউয়ের কানের দুল ছিনতাইকারী নিয়ে গেল ('কানেট চোরে নিল কানই মাগই')[১৯] পথে ডাকাত পড়ার ভয় করছে একজন সাধারণ মানুষ ('বাটত খান্টবি বলআ')।[২০] এতে বোঝা যায়, প্রাচীন বাংলায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতি যুগপৎ ঘরে ও বাইরে ভেঙ্গে পড়েছিল। সাধারণ নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও জীবনের নিরাপত্তা দিতে তৎকালীন প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছিল।

৯.৭ দেশে আইনের শাসনের অভাবে প্রশাসনে দেখা দিয়েছিল এভাবে শিথিলতা, ফলে 'গুণ্ডাবদমাশের' স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল স্বদেশ। সেই প্রাচীন কাব্যেও 'গুণ্ডা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় স্বচ্ছন্দে (গুরুবঅন বিহারে রে থাকিব তই খুণ্ড কইসে')।[২১]

এমন একটা পরিস্থিতিতে যা হবার তাই হলো। সমগ্র বঙ্গ দেশই লুণ্ঠিত হলো (অদঅ বাঙ্গাল দেশ লুড়িউ')।[২২]

১০.০ রাজা সংবাদ

১০.১ তবু রাজা ছিল, ছিল তার মন্ত্রী। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় অরাজকতা, অনিয়ম। মন্ত্রী নিজে রাজাকে বিভিন্ন কাজে বাধা দিচ্ছেন, রাজাকে মন্ত্রী দ্বারা নিবৃত্ত হওয়ার কথা আছে একটি পদে ('মতিঁএ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা')। বোঝা যায়, প্রশাসন ব্যবস্থা তার স্বাভাবিক গতি হারিয়েছিল।[২৩]

১০.২ এমন রাজা সম্পর্কে জনগণেরও প্রশ্ন ছিল, আস্থা ছিল না তাঁর প্রতি সাধারণ নাগরিকের। কারণ তার থেকে কোনো সুফল মানুষ দেখতে পাচ্ছিলো না। রাজা মোহ দ্বারা আবদ্ধ অথবা ভোগ বিলাসে মত্ত এমন অভিযোগ রয়েছে চর্যার পদসমূহে ('রাআ রাআরে, অবর রাঅ মোহেঁর বাধা')।[২৪]

১০.৩ রাজা কর্তৃক শাসন পাট্টা দান বা জারী করার প্রথা প্রচলিত ছিল প্রাচীন বাংলায় সেটা বোঝা যায়। কিন্তু প্রশাসনিক শৃংখলা ও শাসন ব্যবস্থা যেখানে এইরূপ সেখানে শাসন পাট্টার অস্তিত্ব থাকে কিভাবে। তাই একটি পদে উল্লেখিত হয়েছে শাসন পাট্টা গড়ে যাওয়ার কথা (দগ্ধ হাল নবগুন শাসন পাট্টা')[২৫]

১০.৪ ডঃ আনিসুজ্জামান চর্যাপদে প্রাচীন বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বলেছেন, চর্যাপদে 'রাজার উল্লেখ আছে বটে, তবে তিনি শাসন পাট্টা দান করা ছাড়া শান্তিকালে আর কি করতেন, তা বোঝা যায় না'। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, 'যুদ্ধের সময়ে তারা সেনামণ্ডল তূর্য শঙ্খধ্বনি করে যাত্রা করতেন। তাঁদের মধ্যে অশ্বারাহী সেনা থাকতো। বিপক্ষের দুর্গ বা প্রধান স্থান জয় করতে পারলে বিজয় নিশ্চিত হতো।'[২৬]

১০.৫ চর্যাপদ সাহিত্য দলিলে প্রাচীন বাংলার প্রশাসন, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সমসাময়িক অন্যান্য দলিলযোগে তার স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ–

> 'তারনাথের বিবৃতিমতে' ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া অভূতপূর্ব নৈরাজ্যের সূত্রপাত হয়। গৌড়–বঙ্গ–সমতটে তখন আর কোন রাজার আধিপত্য নাই, রাষ্ট্র ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন, ক্ষত্রিয়, বণিক, ব্রাহ্মণ, নাগরিক স্ব স্ব গৃহে সকলেই রাজা। আজ একজন রাজা হইতেছেন, কাল তাঁহার ছিন্ন মস্তক ধুলায় লুটাইতেছে। ইহার চেয়ে 'নৈরাজ্যের বাস্তব চিত্র আর কী হইতে পারে।'[২৭]

১১.০ প্রাচীন বাংলার ভূমি ব্যবস্থা

১১.১ প্রাচীন বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থার অন্যতম দিক হচ্ছে ভূমি প্রশাসনের স্বরূপ। তৎকালীন বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা সমকালীন সামাজিক ও প্রশাসনিক বিন্যাসকেও

চিহ্নিত করে। এসব চিত্র উদঘাটনে যেসব প্রামাণ্য কাগজপত্র ইতিহাস হিসেবে কাজ করেছে তার প্রধান হচ্ছে ঃ

১. রাজাদের ভূমি দান পত্র
২. রাজকীয় ভূমি বিক্রয় দলিল

তাম্র পট্টোলী

৩. প্রাচীনতম স্মৃতি শাস্ত্র
৪. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র
৫. সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্নগ্রন্থ
৬. পালি ভাষায় রচিত জাতক গ্রন্থাদি
৭. হিন্দু পুরাণ, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি।

১১.২ তবে প্রাপ্ত তথ্যাদি নির্ভর ভূমি ব্যবস্থার চিত্রসমূহ নিখিল বাংলার সর্বত্র নির্বিচারে সত্য ছিল একথা হলফ করে বলা সম্ভব নয়। কারণ একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, আজো বাংলাদেশের ভূমি মানের একক সর্বজনীন নয়। কোনো এলাকায় জমির গণ্ডার হিসাব, কোথাও কানি, কোথাও পাখি, কোথাও বিঘা, আবার কোথাও কাঠার হিসেব প্রচলিত রয়েছে। অবশ্য তথ্য প্রমাণাদি থেকে এই বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বাংলার ভূমি ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীয়ভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রাচীন বাংলার ভূমি নীতির প্রধান বিষয়গুলি সূত্রায়ন করলে দাঁড়ায়ঃ

(১) ভূমি ক্রয় বা বিক্রয়ের পূর্বে রাজ সরকারের কাছে আবেদন করতে হতো

(২) প্রাচীন বাংলার ভূমি ক্রয় বা বিক্রয়ের প্রধান ইচ্ছাই দেখতে পাওয়া যায় ধর্মীয় প্রেরণা তথা দেবতা–তুষ্টি

(৩) রাজ সরকারের পক্ষ থেকে যিনি ভূমি ব্যবস্থা সংরক্ষণ করতেন তার পদবী ছিল পুস্তপাল। পুস্তপাল ক্রয়–বিক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে আগে এই বিষয়টি সুরাহা করে নিতেন যে জমিটি অন্য আর কেউ ক্রয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন কিনা।

(৪) পুস্তপাল জমির মূল্য যথাযথ আছে কিনা এবং তাতে রাজ সরকারের স্বার্থ মিটেছে কিনা তাও নিরীক্ষণ করতেন।

(৫) এরপরই প্রস্তাবিত জমিখানি 'রেজিষ্ঠী' করা হতো। প্রাচীন বাংলার ভূমি প্রশাসনে এই 'রেজিষ্ঠীকে' বলা হয়েছে, 'পট্টীকৃত'।

(৬) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন বাংলার ভূমি নীতিতে আরেকটি অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে যিনি ভূমি কিনছেন, তাকে ভূমির মূল্যের ওপর রাজ সরকারে ক্রটি করও দিতে হবে।

(৭) তবে প্রাচীন বাংলার ভূমি প্রশাসনের ইতিহাসে এই কর আদায়ের ঘটনা নেই বললেই চলে। কারণ ব্যক্তিগত কারণে অর্থাৎ সম্পত্তি বৃদ্ধির মানসে জমি বিক্রয়ের কোনো অবকাশ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে না। কারণ সকল জমির মালিকই হচ্ছে একমাত্র রাজা। রাজা কোন গৃহস্থকে নেহাৎ সম্পত্তি বৃদ্ধির মানসে ভূমি ক্রয়ের

সুযোগ দানের বিষয়টি প্রাচীন যুগে অবান্তর। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের এই বিষয়গুলি নিছকই ধর্মীয় প্রেরণায় এই যে, ধর্মাচরনোদ্দেশ্যে এসব জমি প্রাচীন বাংলায় ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এবং এখানে সমস্ত জমিই বিক্রি করছেন একমাত্র রাজা। অনেক ক্ষেত্রেই এসব ক্রয় বিক্রয় ছিল দানমাত্র। আর এ দানের প্রধান পাত্র অর্থাৎ দান গ্রহিতা ছিলেন মূলতঃ ব্রাহ্মণরাই। রাজা তাদের বিভিন্ন সময়ে গ্রামের পর গ্রাম লিখে দিচ্ছেন এ জন্যে যে, ব্রাহ্মণরা ধর্ম রক্ষার্থে এ জমির আয় ও অন্যান্য বিষয় ব্যবহারকরবেন।

১১.৩ সিলেট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দ কেশব দেবের লিপি থেকে বোঝা যায়, রাজা স্বেচ্ছায়ই ধর্ম প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্যে ভূমি দান করেছেন। দেবোত্তর সম্পত্তির মূল নির্বাহী ব্রাহ্মণের নামে এর দলিল সম্পন্ন হচ্ছে।[২৮]

১১.৪ ভাবতে অবাক লাগে যে, প্রাচীন বাংলায় সপ্তম শতকের পরে সাধারণভাবে কোনো সাধারণ মানুষ বা গৃহস্থকে জমি বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে না। সর্বত্রই এই কার্য সম্পাদন করছেন রাষ্ট্রীয় প্রশাসন কিংবা রাজা স্বয়ং। অনুমান করতে বাধা নেই যে, – সপ্তম শতকের পরে প্রাচীন বাংলায় সাধারণ মানুষের সেই অধিকার ছিল না। সপ্তম শতকের পূর্বে প্রাচীন বাংলায় অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ গৃহস্থকে ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। যেহেতু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের পুরো বিষয়টি ছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে 'সেহেতু এরূপ সিদ্ধান্তে আসা খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সপ্তম শতকের পরে ব্যক্তি জীবন-যাপনের থেকে ধর্ম রাষ্ট্রীয় আচ্ছাদনে পরিণত হয়।

১২.০ রাজস্ব নীতি

১২.১ ভূমি প্রশাসনের এক্ষেত্রে একটি মূল সমস্যা ছিল এই যে, রাজা যখন ভূমি দান করতেন (দেবোত্তর অথবা অন্য যে কোনো কারণে) তখন পুরো গ্রামবাসীকে কর অথবা অন্য যে কোনো সেলামী কিংবা উৎপাদিত শস্যের ভাগ ইত্যাদি দিতে হতো দান গ্রহীতা ব্যক্তিকেই, রাজাকে আর নয়।

১২.২ ভূমি প্রশাসনের একটি মূল বিষয় ছিল করনীতি। কর ব্যবস্থায় ভাগ, ভোগ, কর ও হিরণ্য নামে চার প্রকার পদ্ধতিই ব্যবহৃত হতো। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ছিল সাধারণ কর-নীতির অতিরিক্তঃ

১. দশ রকম অপরাধের কোনো অপরাধে অপরাধী হলে জমিমানা কর প্রচলিত ছিল
২. হাট, বাজার, খেয়াঘাট ইত্যাদিতে কর প্রথা চালু ছিল
৩. চোর-ডাকাত থেকে রক্ষণাবেক্ষণের কর (বর্তমানের চৌকিদারী-ট্যাক্সের অনুরূপ)
৪. 'পীড়া' কর চালু ছিল রাজার বিশেষ বিশেষ কার্য উপলক্ষে
৫. রাজপুত্রের জন্ম, রাজকন্যার বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষেও কর বসতো প্রজারউপরে।[২৯]

১৩.০ উপসংহার

এভাবে প্রাচীন বাংলার একটি রাজনৈতিক–প্রশাসনিক সমাজ চিত্রের আভাস আমরা পাচ্ছি। তবে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক –প্রশাসনিক ইতিহাসের সব খবর ও তথ্য, আবিষ্কৃত হয়ে গেছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে শত শত বছর পরেও প্রাচীন বাংলার সমাজ কাঠামো রাষ্টচিন্তা ও প্রশাসন এবং ভূমি ব্যবস্থার হাল এই অতি আধুনিক সমাজেও অনুসৃত, একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। 'আবহমান বাংলা' বলে যে ঐতিহ্যিক চেতনার কথা বলা হয়, তা বোধ হয় এই ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট কাঠামো ও রাষ্ট চিন্তায় নিয়তই প্রবহমান একথা অত্যন্ত জোরের সাথে বলা চলে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ঋগ্বেদ সংহিতা (প্রথম খন্ড), রমেশ চন্দ্র দত্ত অনূদিত, পঞ্চম মন্ডল, ১৮ সুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮২

২. অতুল সুর, বাংলার সামাজিক ইতিহাস (কলকাতা, ১৯৭৬), পৃষ্ঠা, ১৩

৩. ঋগ্বেদের চতুর্থ মন্ডলের ২৮ সুক্তে বলা হয়েছে 'ইন্দ্র মধ্যাহ্নের পূর্বে সংগ্রামে দস্যুদিগকে বধ করিয়াছেন এবং অগ্নি কতকগুলিকে দগ্ধ করিয়াছেন।' (ঋগ্বেদ সংহিতা, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫২)। এছাড়া , দশম মন্ডলের ২৩ সুক্তে আরো কড়া সুরে বলা হচ্ছে, 'আমি দাস অর্থাৎ দস্যু জাতির নাম পর্যন্ত উঠাইয়া দিতেছি'। (ঋগ্বেদ সংহিতা, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৩)।

৪. অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮

৫. ঋগ্বেদ সংহিতা (দ্বিতীয় খন্ড, পূর্বোক্ত, দশম মন্ডল ১০ সুক্ত), পৃষ্ঠা ৭০৩

৬. ফিউদর করোভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), প্রগতিপ্রকাশন, মস্কো (বাংলা অনুবাদ ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ১১৭

৭. ঐ, পৃষ্ঠা ১১৭

৮. অরবিন্দ পোদ্দার, মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, (তৃতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৮১) পৃষ্ঠা, ৭

৯. The History of Bengal, Vol. I (Hindu Period), edited by R. C. Majeimder (University of Dacca, 1943), P 578

১০. নীহারঞ্জন রায়, বাঙ্গালির ইতিহাস, (আদিপর্ব, জ্যোৎস্না সিংহরায় কর্তৃক সংকলিত, কলিকাতা, ১৩৮২) পৃষ্ঠা ১৬০–১৬১

১১. ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩২–১৩৪

১২. অজয় রায়, বাংলা ও বাঙ্গালী (ঢাকা, বালা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃষ্ঠা ১৪১

১৩. ভারত বর্ষের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩২–১৩৪

১৪. ঐ পৃষ্ঠা ১৩৯–১৪১

১৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮–৭৫

১৬. ঐ পৃষ্ঠা ৬৮–৭৫

১৭. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, চর্যাগীতিকা (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৩), পদ নং ৩৩, পৃষ্ঠা ১৫১

১৮. ঐ পৃষ্ঠা ১৫১

১৯. ঐ, পদ নং ২ পৃষ্ঠা ৬৫

২০. ঐ, পদ নং ৩৮, পৃষ্ঠা ১৬৬

২১. ঐ পদ নং ৩৯, পৃষ্ঠা ১৬৯

২২. ঐ, পদ নং ৪৯, পৃষ্ঠা ১৯১

২৩. ঐ পদ নং ১২, পৃষ্ঠা ৯৬

২৪. ঐ পদ নং ৩৪, পৃষ্ঠা ১৫৫

২৫. ঐ, পদ নং ৪৭, পৃষ্ঠা ১৮৯

২৬. আনিসুজ্জামান, স্বরূপের সন্ধানে (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৭৬) পৃষ্ঠা ২৪

২৭. নীহার রঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪১

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৯৮–১২১

২৯. ঐ, পৃষ্ঠা ১২৯